ত্রিপুরায় কংগ্রেস
সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কি কি
ব্যবস্থা নিচ্ছে?

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

মার্চ ১৯৮৮ ● মূল্য ৬·০০

স্যাম পিত্রোদা: রাজীব গান্ধীর পলিটিক্যাল রোবট!

অমিতাভ আবার এলাহাবাদে দাঁড়াচ্ছেন?

বাংলা দখলে কংগ্রেসের গোপন ব্লু প্রিন্ট

কলকাতায় ড্রাগন জ্যোতিষ

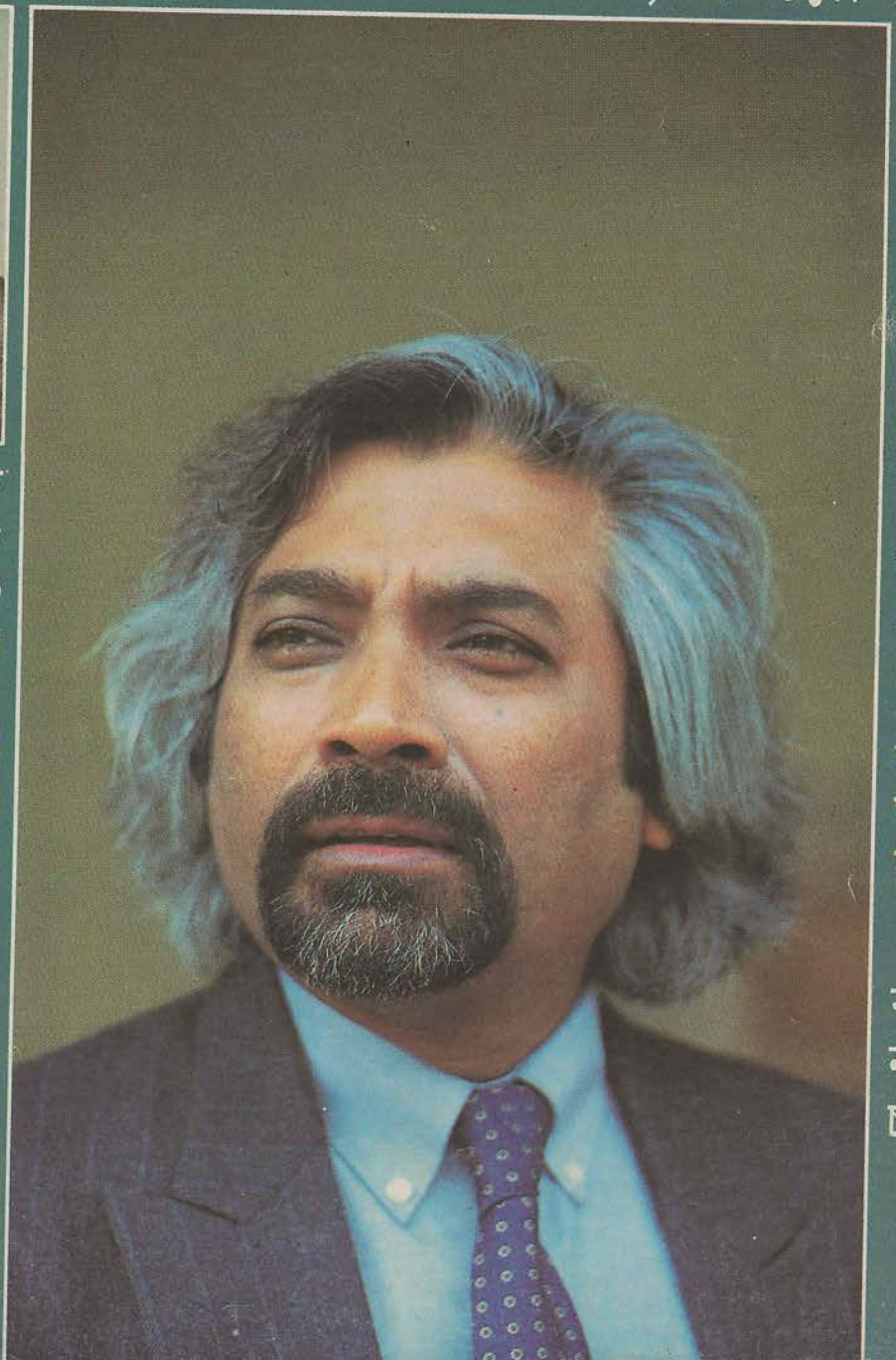

নীরজা: পরলোক থেকে বার্তা

তারকেশ্বরের মন্দিরে পাপ ও দুর্নীতি

কাগজে বিজ্ঞাপন: নায়ক নায়িকা চাই!

স্যাম পিত্রোদা : রাজীব গান্ধীর পলিটিক্যাল রোবট !

স্যাম পিত্রোদা ঃ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

দেশকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ঘোষণা করেছিলেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু ভারতীয় সমস্যাগুলির সমাধান আগামী বারো বছরে কতটা সম্ভব! স্যাম পিত্রোদা নামের লোকটি, যিনি আন্তর্জাতিক যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক প্রবাদপুরুষ, তাঁকে কেন রাজীব গান্ধী নিযুক্ত করলেন তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে? স্যামের হাতে পাঁচটি প্রজেক্ট কি কি? কংগ্রেসের খোলনলচে পালটানোর দায়িত্বই বা কেন দিলেন প্রধানমন্ত্রী এই 'হাই টেকনোলজি'র আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে? **অভয় আগরওয়ালের** সহযোগিতায় প্রতিবেদন পেশ করেছেন **দীপ বসু**।

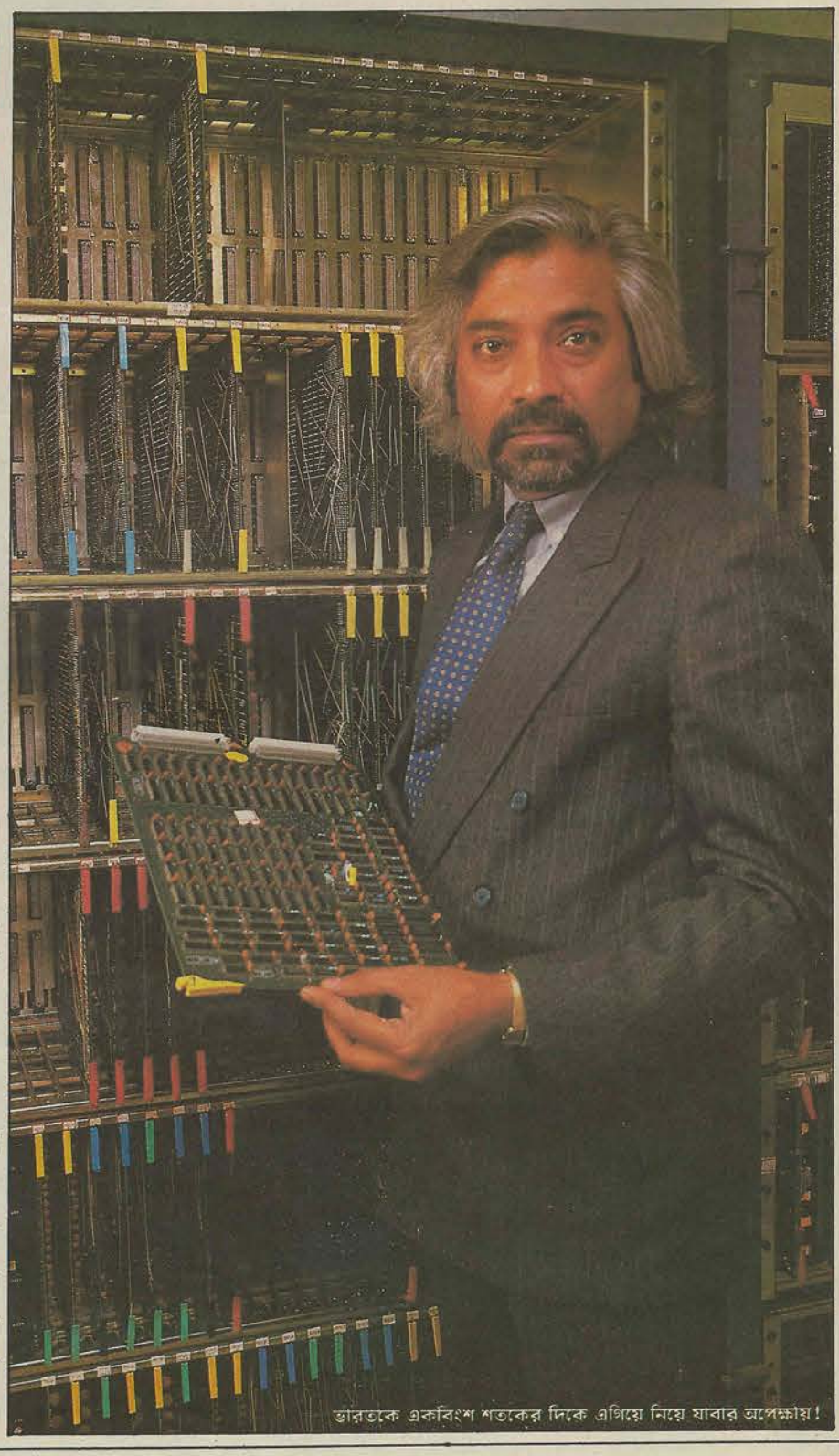

ভারতকে একবিংশ শতকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অপেক্ষায়!

কিছুদিন ধরেই দিল্লির রাজনৈতিক মহলে আলোচনা পর্যালোচনার জের চলছিল। দেশকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শুধু 'হমে দেখনা হ্যায়'–এর পর্যায়েই থেমে থাকতে চান না। তাঁর প্রচেষ্টা আরও গভীরতম উদ্দেশ্যপ্রসারী এবং একাজে তাঁকে সাহায্য করতে যাঁকে পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছেন তিনি আন্তর্জাতিক যোগাযোগব্যবস্থা আর প্রযুক্তির ব্যাপারে এক প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভবত একমাত্র টমাস আলভা এডিসন ছাড়া আর কেউই এতগুলো বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ব্যাপারে পেটেন্ট নিতে পারেননি। বিশ্বের ৩৪টি দেশ তাঁর প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাহায্য নিচ্ছে বর্তমানে। এই দেশগুলির মধ্যে যেমন আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান বা কানাডার মত ধনতান্ত্রিক, উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন দেশ-তেমনই রয়েছে ব্রাজিল, চীন বা যুগোস্লাভিয়ার মত দেশগুলি। আমেরিকাতে দু' দুটি নিজস্ব কোম্পানী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট রয়েছেন অনেকগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। 'রকওয়েল ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে যাঁর আয় ছিল মাসে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা। আরও কয়েকটি কোম্পানী থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার মাসিক আয়–এসব ছেড়ে যে লোকটি এখন ১৯৯০ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষের পাঁচটি প্রধানতম সমস্যার দূরীকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রাজীব গান্ধীকে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর নামটিই কেমন যেন রহস্যজনক। 'মেসিয়া অফ হাই টেকনোলজি' অভিধায় অভিহিত এই লোকটিকে রাজীব গান্ধী আরও যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন তা দেশের প্রধান দল হিসেবে কংগ্রেসকে আগামী শতাব্দীর উপযোগী করে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব। এরপর থেকে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা কল্পনা চলেছে–স্যাম পিত্রোদা লোকটি কোন দেশের! ইতালীয় নয় তো? কেউ বলছেন জার্মান! এদিকে রাজীব গান্ধীর পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর পদমর্যাদা একজন রাজ্যমন্ত্রীর সমতুল্য! এহেন ব্যক্তি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাটাই স্বাভাবিক।

সহকারী জয়রামের সঙ্গে

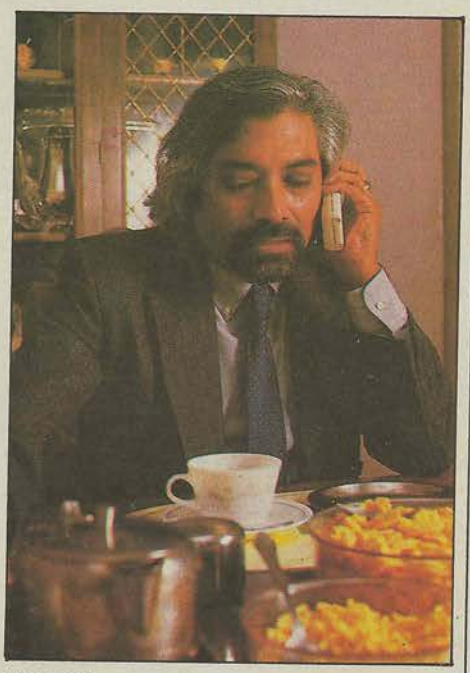

সদাব্যস্ত!

পত্নীর সঙ্গে বাড়ির বাগানে স্যাম পিত্রোদা

আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব

পুরো নাম সত্যেন গঙ্গারাম পিত্রোদা। নিজেই বলেন, 'আমরা জাতে ছুতোর, ছোটজাত'। গুজরাত থেকে বাবা এসেছিলেন ওড়িশায় ভাগ্যান্বেষণে। পঞ্চম শ্রেণী অব্দি পড়াশুনো স্যাম–এর বাবার। তিন ভাই আর পাঁচ বোনের মধ্যে তৃতীয়। গুজরাতি হলেও বাড়িতে কথাবার্তা থেকে শুরু করে লেখাপড়া সবই শুরু করেছিলেন ওড়িয়াতে। স্যাম–এর কথায় 'আমার বাবা মা ছিলেন গরীব, পড়াশুনোও তেমন জানতেন না। কিন্তু তাঁরা আমাকে ভালবাসা দিয়েছেন যথেষ্ট, আর দিয়েছেন উৎসাহ। এই জিনিসগুলি আমার জীবনে অনেক কাজে এসেছে।'

ছেলেরা পড়াশুনো করে বড় হোক এই আশায় স্যামকে কোনও সূত্রে গুজরাতের বল্লভ বিদ্যানগরের একটা বোর্ডিং স্কুলে পাঠান তাঁর বাবা

মা। সঙ্গে তার বড় ভাই। দুহাজার মাইল দূরের এই জায়গাটায় ওড়িশায় তাদের বাড়ি থেকে ট্রেনে আসতে সময় লাগত তিন দিন। দুটি ছোট ছোট ছেলে সেই থেকেই স্বনির্ভর হতে শুরু করে। স্যামের আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠার সেই শুরু।

শুরু থেকেই স্যাম পড়াশুনো ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে শুরু করেন। বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টাও ছিল তাঁর মধ্যে সহজাত। 'সবসময়েই বন্ধু পেয়েছি আমি—আর সেটাই আমার একটা বড় পাওয়া…' স্যাম আজ খ্যাতি আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও মনে করতে পারেন তার স্কুলের বন্ধুদের। এরকম একটা ঘটনার কথা স্মরণ করেন তিনি। কিছুদিন আগে এক ট্রাক ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কোনও গুজরাতি কাগজে স্যাম সম্বন্ধে পড়ার পর দেখা করবার ইচ্ছে জাগে তাঁর। এই ট্রাক ড্রাইভার ভদ্রলোক ৩০-৩৫ বছর আগে স্যামের সঙ্গে গুজরাতের সেই স্কুলে পড়তেন। বাড়ির প্রহরীরা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না তাঁকে। একজন ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করার মত সময় নিশ্চয়ই নেই প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতার। লোকটি তবুও ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলেন তাঁর বাড়ির বাইরে প্রহরীদের বিদ্রুপদৃষ্টির সামনে। এমন সময় স্যাম এসে পড়লেন। গাড়ি থেকে নামতেই লোকটি তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। আর আশ্চর্য এই ৩০-৩৫ বছর পরেও তাঁকে চিনতে পারলেন স্যাম। প্রহরীদের অবাক চোখের সামনে দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন বাড়ির ভেতরে। একসঙ্গে নৈশভোজ করলেন, সুখদুঃখের কথা-পরিবার পরিজনের কথা নিয়ে আলাপচারিতা জমালেন। এত ঘনিষ্ঠতা দেখে বাড়ির কাজের লোকেরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

এই হলেন স্যাম। ঘাড় অব্দি নেমে আসা উসকো খুশকো চুল, সর্বক্ষণ কাজ করেই যাচ্ছেন। যখন কথা বলেন তখন এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন যে তাঁকে ভীষণ আত্মম্ভরি মনে হয়। কিন্তু তিনিই আবার কখনও নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তখন ছেলেবেলার কথা, নিজের বিয়ে নিয়ে সামাজিক সমস্যার কথা, তথাকথিত 'লোয়ার কাস্ট অরিজিন' এসব নিয়ে অকপটে বলে যান। এখন ভারতে মাসের অধিকাংশ সময়ই কাটে সরকারের দেওয়া অফিসে, ব্যস্ততায়, নয়তো গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে। সাংবাদিকদের পারতপক্ষে এড়িয়েই চলেন তিনি।

স্যামের বয়স যখন ১৪ তখন, বড় ভাইয়ের সঙ্গে মফঃস্বলি সেই স্কুল ছেড়ে বরোদায় চলে যান। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দুভাই মিলে থাকতে শুরু করলেন। 'এযেন পৃথিবীর অর্ধেকটা জয় করে ফেলার মতন! বাবা মা আসতে পারতেন না। আমরাও বাড়িতে যেতাম না বড় একটা। কিন্তু এখানেই মনে হল, আমরা বড় হয়ে গেছি। এবার আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই।'

গরীব ঘরের ছেলে, কিন্তু উৎসাহের খামতি

স্যামের আবিষ্কৃত 'কম্পকার্ড'

এতবছরে তাসকে পাল্টানোর কথা আর কেউ ভাবেনি।

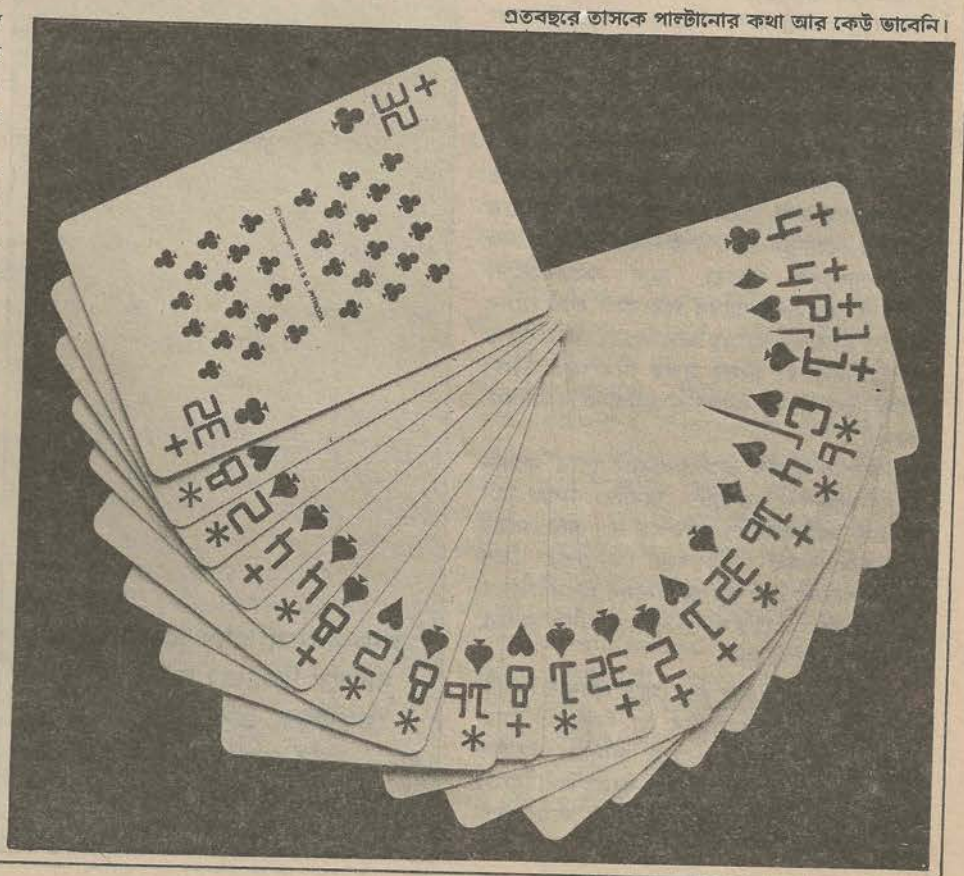

ছিল না কিছুতেই। ডিবেট, নাটক, ছবি আঁকা সব কিছুতেই এগিয়ে আসতেন নিজে থেকে। আর 'কমিউনিকেশন'– যে ব্যাপারে স্যাম আজ বিশ্ববিশ্রুত, তার ভিত্তি অর্থাৎ মেলামেশার ব্যাপারটা, বন্ধুত্বস্থাপন এই ব্যাপারেও অনেক এগিয়ে। 'বন্ধুভাগ্য আমার চিরদিনের। এই বন্ধুরাই আমাকে কতভাবে সাহায্য করেছে কতবার…'। স্যাম স্মৃতিচারণায় ফিরে যান।

ম্যাট্রিক পাশ করে বি এস সি পড়া শুরু করেন বরোদাতেই। এইসময় এক বন্ধুর কাকার সঙ্গে আলাপ হয় স্যামের। ডঃ সেন নামের এই বাঙ্গালি অধ্যাপক বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়নয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ সেনের ডকটরেট ছিল ইলেকট্রনিকসে। এই ডঃ সেনের অধীনেই বরোদা থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম এস সি ডিগ্রী পান স্যাম। ভদ্রলোক স্যামের মধ্যে ইলেকট্রনিকসের প্রতি আর ইলেকট্রনিকসের কল্পরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। স্যামের বড়ভাই অবশ্য পড়াশুনো আগেই ছেড়ে দিয়ে কিছু একটা চাকরি শুরু করেছিলেন। তাঁর পরিবারে স্যামই প্রথম ম্যাট্রিকুলেট। দাদা কিন্তু স্যামকে সবসময়েই উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। ভাই–এর আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট উৎসাহী।

১৯৬৪ সালে চারশ ডলার যোগাড় করে স্যাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ডঃ সেনের উদ্যোগে ইলিয়নয় ইনসস্টিটিউট অফ টেকনলিজর ইলেকট্রিকাল ইনজিনিয়ারিং-এর ক্লাসে ভর্তি হতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

এর আগে একটা ঘটনা ঘটে।

দাদার এক বন্ধুর সূত্রে বরোদায় একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে স্যামের। তাঁর কথায়, 'বন্ধুটির বাগদত্তা মেয়েটির বোন সেই মেয়েটি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তো, তবে কলাবিভাগে। একদিন আমরা আমাদের সাইকেলে করে ওদের বাড়িতে গিয়েছি। আমার মনে আছে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ও। ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। আমি ঠিক করে ফেললাম ওকেই জীবনসঙ্গিনী করব।'

এরপর রোজই তাদের বাড়িতে যেতে থাকেন স্যাম। বুদ্ধিদীপ্ত তরুণটির মেয়েটির বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতেও দেরি হয় না। আর মেয়ের সঙ্গে তো সম্পর্ক এরই মধ্যে নিবিড়তর। কিন্তু অসুবিধে দেখা দিল এরপর। বিয়ের প্রস্তাব দিতেই বেঁকে বসলেন মেয়ের বাবা। স্যামেরা জাতে ছুতোর, মেয়েরা নাগর ব্রাহ্মণ।

স্যাম আমেরিকায় চলে যেতে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। মেয়েটির মা ইতিমধ্যে মারা গেলেন। বাবা চাইলেন মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক, সে যাকে চায় তাকে বিয়ে করেই সুখী হোক। বিয়েতে আর আপত্তি রইলো না। 'সেই মেয়ে…উড়ে এলো আমেরিকায়।' স্যাম তখনও পড়াশুনো

'আমার মনে আছে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ও। ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। আমি ঠিক করে ফেললাম ওকেই জীবনসঙ্গিনী করব।'

করছেন। দিনে চার ঘন্টা করে কাজ করেন একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে, পড়াশুনোর খরচা চালাতে। তবু তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাদের খরচাতেই বিয়ে। বেশ কিছু পার্টটাইম চাকরি করতে করতেই ১৯৬৭তে একটা ব্রেক পেয়ে গেলেন স্যাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা কোম্পানী 'জেনারেল টেলিফোন অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস'–এরই একটা সহায়ক সংস্থা 'অটোমেটিক জেনারেল ল্যাবরেটরিস'–এর একটা প্রজেক্ট-এ ডিজিটাল সুইচিং-এর ব্যাপারে গবেষণার দায়িত্ব পেয়ে গেলেন তিনি। টেলিকমিউনিকেশনের জগতে এরপর স্যামের জীবন–তিনি ভিদি ভিসি (এলাম–দেখলাম আর জয় করলাম)-র জীবন। একটা সময় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাঁর নিত্যনূতন আবিষ্কারের পেটেন্ট ফাইল করার জন্য পাঁচ পাঁচজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছিল তাঁকে। স্যাম পিত্রোদা এরপর নিজের কোম্পানী খোলার কথা ভাবতে থাকেন।

ক্লিন্ট পেনি আর অ্যালান ব্রাউন নামের দুজন অর্থ বিনিয়োগকারিকে যোগাড় করতে সক্ষম হলেন স্যাম। তিনজনে মিলে 'ওয়েসকম ইনকরপোরেশন'-এর স্থাপনা করলেন। ক্লিন্ট-এর বয়স ৬০, আর অ্যালান ৫০ বছরের। অর্থবিনিয়োগ ছাড়া আর খুব একটা বেশি কিছু করার দায়িত্ব ছিল না তাঁদের। স্যামের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি হয়েছিল যে ডিজিট্যাল সুইচিং সহ টেলিকমিউনিকেশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিষ্কার–গবেষণা আর কোম্পানী চালানোর ব্যাপারটা পুরোপুরি দেখাশোনা করবেন তিনি। যদি ব্যবসা লাভের মুখ দেখতে পারে তবে স্যাম পাবেন কোম্পানী শেয়ারের দশ পার্সেন্ট।

জেনারেল টেলিফোন অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকসের চাকরিতে ততদিনে প্রতিষ্ঠিত স্যাম। কিন্তু এই ঝুঁকি নিতে পেছপা হলেন না তিনি। এইসব দিনগুলোর কথা স্মরণ করেছেন স্যাম। অন্যান্য সকলে যখন সংসার, স্ত্রী, বাড়িঘর, ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর দিকে নজর দেয়–পারিবারিক জীবনের সেই শুরুর দিনগুলোতে স্যামের ছিল শুধু কাজ আর কাজ। জীবনটাকে বাজি রেখে, স্থায়ী সাফল্যের দিকে এগোনোর জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

রিসার্চ, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং–'ওয়েসকম'-এর এই তিনটে দিক নিয়েই তখন পাগলের মত খাটছেন স্যাম। অবশেষে এল সাফল্য। ১৯৮০ তে। 'ওয়েসকম ইনকরপোরেশন'-এর আয় ১৯৭৪ থেকে ১৯৮০ এই সময়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল ১০ কোটি ডলারে।

কিন্তু এরপরেই স্যামের সামনে আবার আসে পরীক্ষার মুহূর্ত। সিনিয়ার পার্টনার ক্লিন্ট পেনি পারিবারিক কারণে তাঁর টাকাটা তুলে নিতে চান। আরেক পার্টনার অ্যালান ব্রাউনও এরপর চাইলেন তাঁর শেয়ার উইথড্র করতে। এদের কাছে টাকাটাই ছিল মুখ্য ব্যাপার, টেলিকমিউনিকেশনের নতুনতর সম্ভাবনার ব্যাপারে কারোরই তেমন

উৎসাহ ছিল না। স্যাম পিত্রোদার কাছে যোগাযোগের এই নতুনতর দিগন্ত উন্মোচনের ব্যাপারটা ততদিনে হয়ে দাঁড়িয়েছিল নেশার মতন। কিন্তু কোম্পানীকে কিনে নেবার মত সামর্থ তখন তাঁর ছিল না।

এমনকি সবচেয়ে কম মূল্যের শেয়ারহোল্ডার হওয়ার দরুন কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কোনও ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

'ওয়েসকম ইনকর্পোরেশন' বিক্রি করে দেবার জন্য এরপর দুই সিনিয়র পার্টনার ক্রেতার সন্ধান শুরু করে দেন। ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার মার্কেটে কোম্পানীর শেয়ারদরের ওঠানামার দিকে অসহায়ভাবে লক্ষ্য রাখা ছাড়া স্যামের তখন আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না।

এরপর কোম্পানীটি বিক্রি হয়ে যায় 'রকওয়েল ইন্টারন্যাশনাল'-এর কাছে। এবং এই ডিলে যে শর্ত আরোপিত হয় তাতে স্যামকে বণ্ড সই করতে হয় যে তিনি কমপক্ষে ৩ বছর যুক্ত থাকবেন রকওয়েল-এর সঙ্গে।

আর এই সময়সীমায় টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কোনও নতুন গবেষণায়ও তিনি হাত দিতে পারবেন না। এই চুক্তি মেনে নেবার পর–বিক্রির টাকায় নিজের শেয়ার অনুযায়ী প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা পান স্যাম।

'রকওয়েল ইনটারন্যাশনাল'-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বার্ষিক প্রায় ছ লক্ষ ডলারের বার্ষিক বেতন-এর ব্যাপারটাও নির্দিষ্ট হয় এর পর।

বণ্ড-এর তিন বছরের সময়সীমা শেষ হতেই রকওয়েল-এর চাকরিটা ছেড়ে দেন।

এরপর বিভিন্ন কোম্পানীর টেকনোলজিকাল অ্যাডভাইসার হিসেবে কাজ করেন স্যাম। বেশ কিছু দায়িত্বপূর্ণ প্রজেকট হাতে নেন। 'মারটেক ইনকরপোরেশন'-এর হয়ে ফ্যাকটরি অটোমেশন সফটওয়্যার তৈরির ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, 'মাইক্রো টেকনলজিস ইনকরপোরেশন'-এর হয়ে হাইব্রিড মাইক্রোসারকিট তৈরি, 'এনমে ইনকরপোরেশন'-এর জন্য ইলেকট্রনিক সিক্যুরিটি সিসটেম-এর উদ্ভাবন-এর কাজ করেন তিনি। তাঁর উদ্ভাবনের পেটেন্ট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় অর্ধশতকে।

এডিসন সম্বন্ধে যেমন বলা হত তিনি খেতে ঘুমোতে সবসময়েই নতুন আবিষ্কার নিয়ে চিন্তা করে যেতেন, স্যামের অবস্থাটাও দাঁড়াল সেই অবস্থায়। যে বিষয়ে নজর দেন সেখানেই ঘটে যায় তাঁর উদ্ভাবনের মিডাস স্পর্শ।

যেমন তাঁর উদ্ভাবিত 'কম্পকার্ড' (কমপিউটারে ব্যবহারক্ষম তাস)-এর ব্যাপারটা। গত প্রায় হাজার বছর ধরে দুনিয়াময় কোনও না কোনভাবে তাস খেলা হয়ে আসছে, কিন্তু তাস-এর মৌলিক ব্যাপারগুলোর পরিবর্তন করার কথা কখনই কারো মাথায় আসেনি–মনে হয়নি যে তাসের মূল পরিকল্পনার অনেকগুলো ব্যাপারই অবৈজ্ঞানিক। আজ বিশ্বের সেরা দাবারুরা দাবার নতুন নতুন চাল উদ্ভাবন করেন, দাবা খেলেন কমপিউটারের সাহায্যে। কিন্তু তাসের ব্যাপারটায় সেই সনাতনী ধারার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

লোকে রহস্য করে বলে, রাজা আর রাণীর ব্যাপারটা এখন রয়ে গেছে স্রেফ দুজায়গায়–ব্রিটেনে আর তাসের পিঠে। শিশুপাঠ্য গল্পগাথায়ও রাজা-রাণী হয়ে গেছে অপাংক্তেয়–এসেছে রোবট, স্পাইডারম্যান, ই টি–কিন্তু সেই সামন্ততান্ত্রিক পোষাক আশাক নিয়ে সাহেব-বিবি আর গোলাম এখনও রয়ে গেছে বহাল তবিয়তে। আর চার তেরোয় বাহান্ন, এইসব অদ্ভুত সংখ্যা, বিজ্ঞানের যুগে এসব যে ক্রমশঃ অচল হয়ে আসছে সেটা স্যামেরও মাথায় আসতো না যদি না তিনি উৎসাহিত হতেন তাঁর দশ বছরের ছেলে সলিলের আচমকা একটা কথায়।

সলিল জন্ম থেকেই আমেরিকায়। ছেলেবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছে বাবার টেকনোলজি আর কমপিউটার প্রযুক্তির ছায়ায়। সাত আট বছর বয়স থেকেই হোম কমপিউটার অপারেট করতে পারে সলিল।

কথাপ্রসঙ্গে স্যাম একদিন ছেলেকে বলেন, 'তাস খেলতে পারিস?' ছেলে চটজলদি উত্তর দেয় 'ওসব রাজা রাণী মার্কা জবরজং ভালো লাগে না। কমপিউটার গেমই আমার ভালো।'

স্যামের মাথায় আচমকা খেলে যায়, তাস খেলার ব্যাপারটাকে কমপিউটারের উপযোগী করে পালটালে কেমন হয়?

দু একদিনের মধ্যেই স্যামের মাথা থেকে জন্ম নিল বিশ্বের সর্বপ্রথম 'বায়নারি কার্ডস।'

১৩টি তাসের চার সেটের বদলে স্যামের উদ্ভাবন ১৬টি করে তাসের চার সেট। কমপিউটারে ব্যবহারের সুবিধের জন্য বায়নারি (দ্বিঘাত) ফর্মূলা কাজে লাগিয়ে তাসের নম্বর নির্দিষ্ট হল–১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮। প্রত্যেক তাসের আবার দুধরনের প্রকারভেদ। যোগচিহ্নিত (+) আর গুণচিহ্নিত (*)।

১২৮ নম্বর তাসটি হচ্ছে প্রোগ্রামার। জোকার-এর বদলে এসেছে 'কমপিউটার বাগ'। গুণচিহ্নিত সংখ্যা (ধরা যাক ২ *), যোগচিহ্নিত (২ +) সংখ্যার চেয়ে উচ্চতর মানসম্পন্ন। মৌলিক ব্যাপারগুলো মোটামুটি জেনে নিলে এর সাহায্যে ব্রিজ, রামি, পোকার তো খেলাই যায়, আরও নতুন নতুন খেলার উদ্ভাবন করা যায়। বিশ্বের তাসুড়েদের মধ্যে স্যামের এই উদ্ভাবন বিপুল সাড়া ফেলেছে ইতিমধ্যেই।

'কম্পকার্ড' ছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয়ের পেটেন্ট নিয়েছেন স্যাম। এখন তার সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে। জাপানের 'তোশিবা' কোম্পানী এখন বাজারে ছাড়তে চলেছে তাঁর উদ্ভাবিত ইলেকট্রনিক ডায়রি।

কিন্তু কমিউনিকেশন টেকনলজিকে শুধু ভোগ্যপণ্যের সীমায় আবদ্ধ করার ব্যাপারে কোনদিনই আগ্রহী ছিলেন না স্যাম। তিনি সবসময়েই চেয়েছেন তাঁর গবেষণার ফল সাফল্য পাক সামাজিক 'বিস্তৃতিতে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে টেলিকমিউনি-কেশনের ভূমিকা নিয়ে এখন 'ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগে চিলিতে গবেষণা চালাচ্ছেন স্যামের এক বন্ধু। রাষ্ট্রসংঘের সম্পর্কিত প্রকল্পের কাজে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছেন স্যাম। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর কাছে এসেছে আমন্ত্রণ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ভারতের কোনও মহল থেকেই তাঁর কাজকর্মের প্রতি কখনই আগ্রহ প্রকাশ করা হয়নি!

অথচ জীবনসংগ্রামের সেই কঠিনতর দিনগুলিতে, অস্তিত্বরক্ষার চূড়ান্ত ক্ষণগুলিতেও জন্মভূমির কথা কখনও ভোলেননি স্যাম। ১৯৬৮ তেই শিকাগোতে প্রকাশ কোঠারির সঙ্গে মিলে 'ইণ্ডিয়া ফোরাম' নামের একটা সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। প্রতি সপ্তাহে একবার দেশের সমস্যাগুলি আর তার সমাধানের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হত এই ফোরামে। শিকাগো ইউনিভার্সিটি, ইলিয়নয় বা নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, প্রযুক্তি আর টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ের ভারতীয় ছাত্রেরা, অধ্যাপকেরা, ভারত প্রেমী বিদেশীরা নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এইসব আলোচনাচক্রে।

এরপর ১৯৮১ সাল নাগাদ এই ফোরামেরই কেউ একটা নিউজপেপার ক্লিপিং দেখান স্যামকে। দেশের টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এইচ·সি· সারিন কমিটি গঠন করেছেন–এই খবরটি ছাপা হয়েছিল সেখানে। স্যাম এইচ সি সারিনকে চিঠি লেখেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শিকাগো থেকে এরপর দিল্লিতে এসে সারিন কমিটির সামনে দেশের টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কি কি করতে পারেন এবং তার বহুমুখী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিষয়ে ২ ঘন্টার একটা ডেমনস্ট্রেশন করেন। এরপর সারিন ও তাঁর সহযোগীরা তাঁকে জানান–'আপনি মিসেস গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন, যদি ওনাকে ইন্টারেস্টেড করে, দেখুন···'। স্যাম বললেন, 'ঠিক আছে–তাই হবে।' কিন্তু সরকারি নিয়ম-কানুন এদেশে অন্যরকমের। পরামর্শ দেওয়া হল, 'আপনি প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি সি আলেকজাণ্ডার-এর সঙ্গে দেখা করুন প্রথমে।' আলেকজাণ্ডার জানালেন, 'দেখুন উনি ভীষণ ব্যস্ত, আমি আপনাকে ১০ মিনিট সময় দিতে পারি ওঁর সঙ্গে দেখা করার'। স্যাম জানালেন, দশ মিনিটে কিছুই বোঝানো যাবে না ওঁকে, কমপক্ষে একঘন্টা সময় চাই। অনুমতি মিলল না। স্যাম আমেরিকায় ফিরে এলেন। এদেশে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে

লালফিতের বাঁধন প্রায় নেইই। স্যাম মাইক্রোসিস্টেম আর সফটওয়্যারের দুটো ছোট কোম্পানীর পত্তন করলেন মিলাউকী আর শিকাগোতে, নিজের যথাসর্বস্ব আয় দিয়ে।

১৯৮৪ তে অরুণ নেহরু আর অরুণ সিং-এর উদ্যোগে স্যামের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা হয়। শ্রীমতী গান্ধীর বাড়িতে ঘন্টাখানেকের ডেমনস্ট্রেশন। স্লাইড, চার্ট, সার্কিট ইত্যাদির সাহায্যে তিনি পাঁচটা প্রোজেকট উপস্থাপিত করেন সেখানে। স্যাম-এর বক্তব্য– শ্রীমতী গান্ধী পুরো ব্যাপারটাই উৎসাহের সঙ্গে দেখেন এবং তিনি যে অভিনব কিছু করতে চান সেই বিষয়ে নিশ্চিত হন। কিন্তু দেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্যামের পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত হতে দেয় না।

সৌভাগ্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে সেই প্রদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজীব গান্ধীও। তিনি তখন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। রাজনীতিতে তরুণ মুখ আনা ছাড়াও রাজীব শুরু থেকেই চাইছিলেন ভারতবর্ষকে প্রযুক্তিগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে। মুখ্যত তাঁরই উদ্যোগে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের একটি দল আমেরিকায় গেল স্যামের কাজকর্ম দেখতে। ১২ দিন ধরে স্যাম তাদের মার্কিন টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তির সেরা প্রতিষ্ঠানগুলি–'বেল ল্যাবরেটরিস', 'জেনারেল টেলিফোন এ্যান্ড ইলেকট্রনিকস', 'রকওয়েল ইন্টারন্যাশনাল'-এর কাজকর্ম দেখালেন। দেখালেন, তাঁর আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে এরা কিভাবে যোগাযোগব্যবস্থায় অভিনবত্ব আর পরিবর্তন আনছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিবিদরাও একবাক্যে স্যামের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করলেন। মোটকথা ভারতীয় দলটি নিশ্চিত হল স্যাম পিত্রোদাই সেই লোক, যিনি দেশের মান্ধাতার আমলের যোগাযোগব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারবেন।

ভারতীয় যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে, বম্বের 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ'-এর কমপিউটার এ্যান্ড কমিউনিকেশন-এর প্রধান এম·ভি· পিৎকে আর 'টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ সেন্টার'-এর বৈজ্ঞানিক, পদ্মশ্রী জি বি মীমাংসী স্যামের কাজকর্মে ভীষণভাবে আগ্রহী হলেন। প্রফেসর পিৎকে স্যামকে পাঠালেন ভারত সরকারের ইলেকট্রনিকস সংক্রান্ত সচিব ডঃ পি·পি· গুপ্তর কাছে। এর আগে ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের অধীন টেলিকমিউনিকেশনের কর্মকর্তারা স্যামকে আদপে আমলই দেননি। কিন্তু ইলেকট্রনিকস আর টেলিকমিউনিকেশন এই দুই সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে রেষারেষি বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক ডঃ গুপ্ত পিত্রোদার কাজকর্মের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন। সরকারের ইলেকট্রনিকস কমিশনের চেয়ারম্যান সঙ্গীবি রাও-ও সমর্থন করলেন ডঃ গুপ্তকে। আমলাবর্গের স্বভাবসিদ্ধ গড়িমসিকে এড়িয়ে স্যাম পিত্রোদা অবশেষে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ

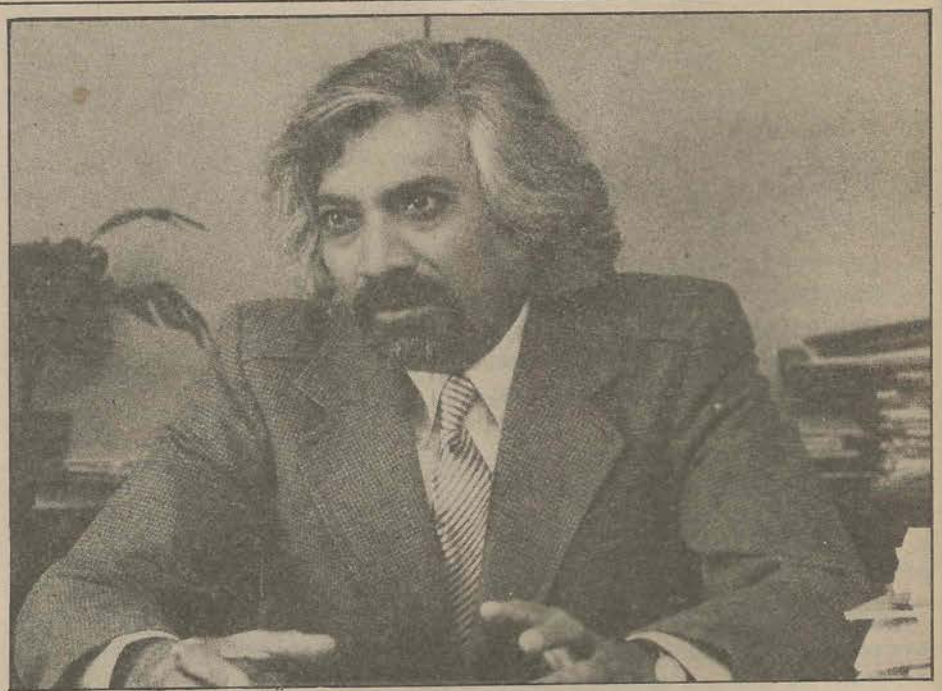

কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব স্যামের

হলেন। সরকারের উদ্যোগে স্যামের কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য অধ্যাপক এম জি কে মেননের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হল। স্যামের পক্ষে এটা একটা উল্লেখযোগ্য জয়লাভ।

মেনন কমিটির রিপোর্টে স্যামের যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করা হল। অবশেষে ১৯৮৪-র ২৫ ফেব্রুয়ারী মন্ত্রীসভা দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে স্যামের প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করলেন।

২৫ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হল C–DOT সংস্থা। এই সরকারী সংস্থার একজিকিউটিভ ডিরেকটর নিযুক্ত হলেন স্যাম পিত্রোদা আর জি বি মীমাংসী। সংস্থার বাজেট নির্দিষ্ট হল ৩৫ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে সময় দেওয়া হল ৩ বছর। এই সময়ের মধ্যে স্যামকে দেখাতে হবে তার প্রয়োগকৌশলের উপযোগিতা।

স্যামের প্রথম কাজ হল 'ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সুইচ সিস্টেম' নির্মাণ, যা ব্যবহৃত হবে P A B X (Private Automatic Branch Exchange), TAX (Trunk Automatic Exchange), MAX (Main Automatic Exchange) আর RAX (Rural Automatic Exchange)-এর প্রয়োজনে। উল্লেখযোগ্য যে এই ধরনের কাজে বিশ্বের বাছা বাছা টেলি-প্রযুক্তিবিদকে কাজে লাগাতে মার্কিন টেলিকম প্রতিষ্ঠান 'এটি অ্যান্ড টি'-এর মত বিশ্ববিশ্রুত প্রতিষ্ঠানের প্রায় বারো বছর ধরে খরচ হয়েছে কয়েকশ কোটি টাকা। তদুপরি পিত্রোদার কাজ ছিল বিশ্বের প্রচলিত সিস্টেমগুলি থেকে আলাদা, তৃতীয় বিশ্বের উপযোগী এক সাশ্রয়ী সিস্টেম গড়ে তোলা।

পিত্রোদা প্রথমেই বেছে নিলেন তৃতীয় বিশ্বের উপযোগী আর সাশ্রয়ী করার দিকটিকে। এমন একটা সিস্টেম-এর উদ্ভাবন করতে হবে যা এয়ার-কন্ডিশনিং ছাড়াই শূণ্য ডিগ্রী (ধরা যাক কাশ্মীরের লে উপত্যকায়) থেকে ৪৫ ডিগ্রী (রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে আলোয়ার-এই ধরা যাক) সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কাজ করে যেতে পারবে। সইতে পারবে শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ৯৫ ভাগের আর্দ্রতার হেরফের, ধুলোবালির প্রভাব আর কানেকশানের অতিরিক্ত বোঝাও যার কাছে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

১৯৮৭র আগস্টে, মিশন শুরু হওয়ার ঠিক তিন বছরের মাথায় C–DOT যখন ঘোষণা করল তারা সাফল্যলাভ করেছে বাজেটের ৩৫ কোটি টাকারও ৫ কোটি টাকা কম খরচা করে, তখন বিশ্বের অগ্রণী টেলিকমিউনিকেশন সংস্থাগুলির টনক নড়ল।

ভারতের অর্থনীতি ও জলবায়ুতে স্যামের প্রকল্প সাফল্যলাভ করা মানেই এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে আগ্রহী করে তোলা। সোজা কথায় এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বহুবছরের একচেটিয়া বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবার আশু সম্ভাবনায় কোম্পানীগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক বাজারে ডিজিট্যাল সুইচিং-এর ক্ষেত্রটির সিংহভাগ এখনও ফরাসী টেলিকম সংস্থা 'অ্যালকাতেল'-এর হাতে। ভারতবর্ষেও এই সিস্টেমের মুখ্য সরবরাহকারী এই কোম্পানীটিই।

প্রথমদিকে স্যাম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের এই কোম্পানীটি এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করে যে স্যামের পরিকল্পনা আসলে

আকাশকুসুম কল্পনাই। অত কম খরচে সবরকম আবহাওয়ার উপযোগী করে টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম তৈরি করার ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত স্বপ্নই থেকে যাবে। কিন্তু তিন বছরের মাথায় সি-ডট যখন তাদের সাফল্যের কথা ঘোষণা করে তখন চটজলদি পুরো প্রজেকটটাকে কিনে নেবার প্রস্তাব দেয় এই 'আলকাতেল'-ই। স্যাম অজস্র টাকার অফার সত্ত্বেও জানালেন, তাঁর একটা মিশন ছিল-সেটা সফল হতে চলেছে। তাঁর প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর জন্যই-কোনও মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর ব্যবসার স্বার্থে নয়।

স্যাম পিত্রোদা আর তাঁর C–DOT-এর প্রাথমিক মিশন সফল। এখন তাঁরা হাত দিয়েছেন পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে। আরও তিনবছর, অর্থাৎ ১৯৯০ পর্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা। এই সময়সীমায় স্যাম আর তার ৩৭৫ জন সহযোগী মূলতঃ ফিল্ড ট্রায়াল, অনেকগুলি মেইন এক্সচেঞ্জের নির্মাণ, সফটওয়্যার মডিফিকেশান, আর সারা দেশের জন্য একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ভিজিট্যাল নেটওয়ার্ক (আই এস ডি এন) গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত থাকবেন।

এপর্যন্ত যে কাজ হয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আর উপদেষ্টামহল সন্তুষ্ট। তিনি স্যামকে তাঁর উপদেষ্টা নিয়োগ করে পাঁচটি টেকনোলজি মিশনের দায়িত্ব দিয়েছেন, যার আওতায় আসবে দেশের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানপ্রয়াস। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ছাড়াও এর আওতায় আসছে শিক্ষা, পানীয় জলের সমস্যা, স্বাস্থ্য, কৃষি আর দেশের প্রধান দল কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ।

অধ্যাপক মীমাংসী, ডঃ পিৎকে আর মুখ্য সহযোগী, প্লানিং কমিশনের জয়েন্ট সেক্রেটারী জয়রামের ওপর C-DOT এর মুখ্য দায়িত্বগুলি ছেড়ে দিয়ে স্যাম এবার মনোনিবেশ করেছেন অন্যান্য সমস্যাগুলির অনুধাবন আর বিশ্লেষণে। দিল্লির 'আকবর হোটেল'-এ C-DOT-এর অফিস ছেড়ে তিনি এখন অধিকাংশ সময়ই ঘুরে বেড়ান দেশের প্রান্তে প্রান্তে। প্রতি সপ্তাহে অন্ততপক্ষে তিনি দুটো রাজ্যে যান, সমস্যাগুলির অনুধাবন করেন, সমাধান সম্ভাবনার ছক তৈরি করেন। সর্বশেষ সংবাদ তিনি দেশের পাবলিক সেকটর প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারেও এখন কাজ শুরু করে দিয়েছেন পুরোদমে।

দেশে হাই টেকনোলজি আমদানির চেষ্টা চলেছে, আমদানি করা হচ্ছে সুপার কমপিউটার–কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তথা ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়ে গেছে সেই মান্ধাতার আমলেই। স্যামের মুখ্য কাজ হবে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ধীরে ধীরে উন্নত করে তোলা। ২০০০ সালে পৌঁছতে আর ১২টি বছর বাকি। কিন্তু প্রচলিত সরকারী ধাঁচের পরিকল্পনা মত উন্নতি ঘটাতে হলে দরকার হবে কমপক্ষে আটটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার।

স্যামের বক্তব্য, উন্নয়নের এই ধীর গতির কারণ 'ল্যাক অফ ইনফর্মেশন' আর 'ল্যাক অফ কমিউনিকেশনস'। এই দুটোরই যুগপৎ উন্নতি ঘটাতে চান স্যাম পিত্রোদা।

যেমন, অশিক্ষার সর্বাঙ্গীন সমস্যাটি। প্রতি তিনজন ভারতবাসীর মধ্যে দুজন নিরক্ষর। মহিলাদের মধ্যে অশিক্ষার এই হার আরও বেশি। অরুণাচল প্রদেশ বা রাজস্থানের মত রাজ্যে প্রতি ৯ জন মহিলার মধ্যে ৮ জনই নিরক্ষর। জনগণনায় দেখা গেছে গত বছরগুলিতে এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৫০ সালে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৩০ কোটি, ১৯৮০ তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৪৪ কোটিতে। পিত্রোদার মতে, এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানষ যে দেশে, সেখানে 'কমিউনিকেশন' কথাটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। পিত্রোদা তাই অশিক্ষা দূরীকরণের প্রকল্পটিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছেন।

তথ্যানুসারে বর্তমানে দেশে ১৫-১৫ বছরের বয়ঃসীমায় নিরক্ষরের সংখ্যা ১১ কোটি। ১৯৯০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১১·৬ কোটিতে।

পিত্রোদার পরিকল্পনায় ১৯৮৭-৯০ এই সময়সীমাটি ৩ কোটি উক্ত বয়ঃসীমার নিরক্ষরকে স্বাক্ষরতার আওতায় আনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৯০-৯৫–এ এই সংখ্যা হবে ৫ কোটি। এইভাবে পিত্রোদার পরিকল্পনামতে ১৫-৩৫ এই বয়ঃসীমায় নিরক্ষরের সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ১·২ কোটিতে। দেশের তারুণ্যশক্তি শিক্ষিত হওয়াটা, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে একটা

ব্যবহারে অনন্য

রিটা

সেলাই মেশিন

বিভিন্নরকমের ঘরোয়া আর শিল্পোদ্যোগে ব্যবহারের উপযোগি মডেলে পাওয়া যায়

adEnvoys

Rita

সারা জীবনের সেবার জন্য

IS:1610

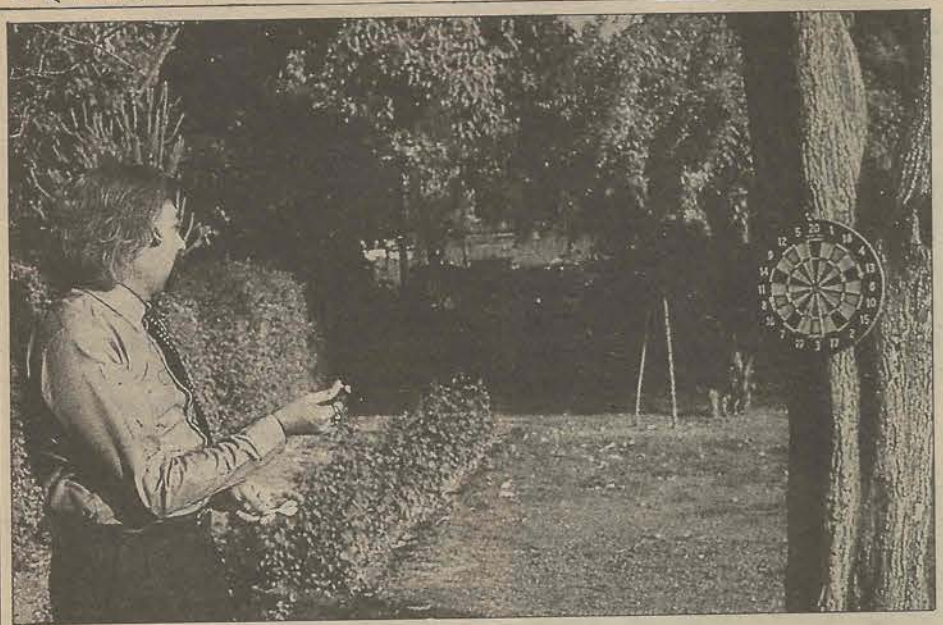

স্যাম নিজের বাগানে রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে পরীক্ষায়

বড় পদক্ষেপ হয়ে দেখা দেবে।

কালার টিভি না পানীয় জল? এই প্রশ্ন উঠেছে অতীতে কয়েকবার। এই বিতর্ক যথার্থ। কারণ সরকারের যে শেষ পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাতে দেশের প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার গ্রামে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। পিত্রোদার পরিকল্পনায় ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রতিটি গ্রামে মানুষ প্রতি প্রতিদিন ৪০ লিটার আর পশুপ্রতি প্রতিদিন ৩০ লিটার জলের ব্যবস্থাকে ছকে ফেলা হয়েছে। এজন্য ৩,০২১ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়েছেন তিনি সরকারের কাছে। প্রথমে প্রতিটি রাজ্যের ৩/৪ টি করে জেলাকে বেছে নিয়েছেন স্যাম।

পশ্চিমবঙ্গের–বাঁকুড়া, মেদিনীপুর আর পুরুলিয়া, বিহারের পালামৌ, পূর্ণিয়া, গিরিডি আর সিংভূম জেলা, ওড়িশার কোরাপুট, ফুলবানি, গঞ্জাম আর ময়ূরভঞ্জ জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল, মেহবুবনগর আর পূর্ব গোদাবরী জেলা, উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর, আগ্রা, উন্নাও, সুলতানপুর জেলা–এমন অনুন্নত ও আদিবাসীপ্রধান জেলাগুলিকে বেছে নিয়ে তাঁর কাজে প্রাথমিক সাফল্য লক্ষ্য করতে চান স্যাম। পরিকল্পনায় আছে আন্দামান নিকোবর আর লাক্ষাদ্বীপের পুরোটাই।

দেশের অগ্রণী কৃষি গবেষণাগারগুলি আর 'কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাসট্রিয়াল রিসার্চ'–এর সহযোগিতায় দেশকে তৈলবীজের উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভর করে তোলার ব্যাপারে ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের আবেদন জানিয়েও পরিকল্পনাও পেশ করেছেন স্যাম।

দেশের ২৮ লক্ষ শিশু প্রতিবছর ১ বছর বয়স হবার আগেই মারা যায়। ১·৭ লক্ষ শিশু আক্রান্ত হয় পোলিওতে। প্রসূতিদের মৃত্যুর হারও এদেশে অবিশ্বাস্যরকমের। ইমিউনাইজেশন–এর ব্যাপারে সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা হাতে নিয়ে পিত্রোদা ইতিমধ্যেই দেশের ৩০টি জেলার ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছেন, ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশের সব কটি জেলা এর আওতায় এসে যাবে তাঁর পরিকল্পনা মত।

স্যাম পিত্রোদা কিন্তু এইসব সম্ভাবনাকে যারা একেবারে উড়িয়ে দিতে চান, তাদের নিরাশ করে বলেছেন–যারা মূল প্রসেসটার বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটিগুলো না জেনে এতদিনকার দেখে আসা পলিটিক্যাল প্রসিডিওরগুলির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে হতাশ হচ্ছেন–তাদের সামনে একটা ছোট্ট উদাহরণ পেশ করতে চাই।

রেলওয়ে বুকিং কমপিউটারাইজড হয়ে যাবার পর পুরো ব্যাপারটাই কত সহজ হয়ে এসেছে–সেটা যে কোনও সাধারণ মানুষ এখন সহজেই বুঝতে পারবেন। আর সব পরিকল্পনাই রাজীব গান্ধীর অনুমোদিত তাই তেমন লাল ফিতে সংক্রান্ত অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না–প্রধানমন্ত্রী এব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন বরাবরই। আর স্যাম অবশ্য বলছেনই–এইসব কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন প্লানিং কমিশনের বিভিন্ন সংস্থা–তিনি শুধু অনুঘটক হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

রাজীব গান্ধী স্যামকে এছাড়া যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি দিয়েছেন–তা হল কংগ্রেসের উজ্জীবন তথা পুনর্নবীকরণ। দলের মধ্য থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিরোধ হয়েছিল প্রথমদিকে–কিন্তু যখন রাজীব গান্ধী নিজে এব্যাপারে সরাসরি উদ্যোগ নিলেন–তখন উমাশঙ্কর দীক্ষিতের মত অন্যান্য নেতারাও চুপ করে যেতে বাধ্য হলেন।

পিত্রোদা স্পষ্ট করেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহেই তিনি এব্যাপারে এগিয়েছেন, তার নিজস্ব কোন উদ্যোগ ছিল না কংগ্রেস পার্টিকে উজ্জীবিত করার। ১৯৮৫–র ডিসেম্বরে বম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস শতবার্ষিকী সমরোহের সময়ই প্রধানমন্ত্রীর এরকম একটা পরিকল্পনার কথা মনে হয়। যখন স্যামের কাছে এবিষয়ে পরিকল্পনা আহ্বান করা হয়-তখন স্যাম কিছুটা সময় চেয়ে নেন–১৯৮৬র জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখে স্যাম ১৯ পাতার পরিকল্পনা পেশ করেন।

এই পরিকল্পনাটি সাতটি ভাগে বিভক্ত। ভূমিকা-উদ্দেশ্য–কার্যকৌশল–প্রয়োগ পরিকল্পনা (অডিট, সংগঠন, ম্যানেজমেন্ট, সুযোগসুবিধা, প্রশিক্ষণ, সদস্যপদ আর অর্থসংগ্রহ), সঙ্গতি, প্রধান ইস্যুগুলি আর সারসংক্ষেপ।

এই কাজে স্যাম পিত্রোদা যে পদক্ষেপগুলি নিতে চান তা হল:

১। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্য, জেলা তালুক, ব্লক, পঞ্চায়েত/ওয়ার্ড স্তরে পার্টির শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা।

২। পার্টি আর দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সম্পন্ন নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

৩। বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বের সঠিক সীমানা-নির্দেশ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের পরিসীমা সম্বন্ধে নির্দেশের স্পষ্টিকরণ।

৪। অন্তর্দলীয় কমিউনিকেশন তথা যোগাযোগের ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দেওয়া।

৫। জনসংগঠন, অর্থবরাদ্দ আর দ্রুত কার্যকরী-ভবনের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

৬। ছাত্র, যুবা, মহিলা, শ্রমিক ও কৃষকদের দলের মূল স্তর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহদের ব্যাপারে বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ।

৭। জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অফিসে টেলিফোন এবং কমপিউটরের সুষ্ঠু প্রয়োগ।

৮। পার্টি প্রশাসনে আধুনিক ম্যানেজমেন্টের কলাকৌশল আমদানি।

৯। ব্লক লেভেল থেকে শুরু করে পার্টির প্রত্যেকটি স্তরের কাজকর্মের পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য 'অ্যানলাইসিস গ্রুপ'–এর স্থাপনা।

১০। পার্টির প্রত্যেকটি স্তরে জাতীয়তাবাদী, সৎ, আর উদার মনোভাবাপন্ন কর্মীদের সমাবেশ।

সব মিলিয়ে এই কাজে বছরে ৩৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন তিনি। স্যামের বক্তব্য এই টাকাটা শুধু পার্টির পুনরুজ্জীবনেই ব্যয় হবে না, এরই সঙ্গে তা সাহায্য করবে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নতিবিধানেও।

সব মিলিয়ে স্যাম পিত্রোদা এখনও এক রহস্য। কেউ বলেছেন তিনি নির্ভেজাল পাগল, আবার অনেকেরই বক্তব্য তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করে বিভিন্ন বৈপ্লবিক ফলাফল দেখিয়েছেন অনেকবার। এবার তার ওপর দায়িত্ব এসেছে দেশের উচ্চতম নেতৃত্বের কাছ থেকে। স্যাম এই কঠিন চ্যালেঞ্জ তাঁর স্বভাববশেই গ্রহণ করেছেন। দেখা যাক এই দেশকে তিনি একবিংশ শতাব্দীর দিকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন! সারা দেশ তারই অপেক্ষায় এখন।

ছবি: গিরীশ শ্রীবাস্তব, অবিনাশ পাসরিচা

২২ পৃষ্ঠার পর

খনির নাম	জাতীয়করণের আগে মালিকের নাম ও ঠিকানা
১) তেওয়ারির বেলডাঙ্গা খাস পো: চুরুলিয়া, জেলা–বর্ধমান	মেসার্স এস সি তেওয়ারি ও অন্যান্য পো: পারমুণ্ডি, জেলা–বর্ধমান
২) জেরেকুরি পো: চুরুলিয়া	জেরেকুরি কোল কোম্পানি প্রা: লি: পো: অফিস বক্স নং ৫৫, জেলা–ধানবাদ
৩) কাসটা বেইল পো: চুরুলিয়া	কাসটা কোল ফিল্ডস্ লি: ৩, সিনাগগ স্ট্রিট, কলকাতা–১
৪) পলাশথালি পো: চুরুলিয়া	পলাশথালি কোল কনসার্ন প্রা: লি: ৫৩, মাছুয়া বাজার রোড, চুঁচুড়া, হুগলী
৫) খাস সিয়ারসোল পো: সিয়ারসোল রাজবাড়ি জেলা–বর্ধমান	কুমার কে এন মালিয়া পো: সিয়ারসোল রাজবাড়ি জেলা–বর্ধমান
৬) সিয়ারসোল পো: বালীগঞ্জ, জেলা–বর্ধমান	সিয়ারসোল কোল কোং লি: ২২, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কলকাতা–১৩
৭) অর্ধগ্রাম খাস পো: অর্ধগ্রাম, জেলা–বর্ধমান	মেসার্স আর কে আগরওয়াল অ্যান্ড সন্স প্রা: লি: পো: ঝরিয়া, জেলা–ধানবাদ
৮) চলবলপুর পো: জেকে নগর	কে এল সিলেকটেড কোল কনসার্ন পো: জে কে নগর
৯) ইস্ট জেমোহারি পো: রানীগঞ্জ	হরসুখদাস বালকিষণদাস ২২, বড়তলা স্ট্রিট, কলকাতা–৭
১০) ইস্ট সাতগ্রাম পো: জে কে নগর	ইস্ট সাতগ্রাম কোল কো: (প্রা: লি:), ১৫৫ ক্যানিং স্টিট, কলকাতা–১
১১) খাস চলবলপুর পো: জে কে নগর	রানী এইচ দেবী অ্যান্ড রানী কে·দেবী, সিয়ারসোল রাজবাড়ি
১২) নিউ জেমোহারি খাস পো: জে কে নগর	নিউ জেমোহারি খাস (কালিয়ারি (প্রা:), পো: সিয়ারসোল রাজবাড়ি
১৩) নর্থ ব্লক পো: জে কে নগর	বিমল কান্তি দে পো: জে কে নগর
১৪) সিলিটেড সিয়ারসোল পো: রানীগঞ্জ	পুরাগমল জগন্নাথ পো: রানীগঞ্জ
১৫) বংশীমুনিয়া ৭ ও ৮ নম্বর স্পট পো: চরণপুর	বেইল কোল কোং লি: ৮ ক্লাইভ রো, কলকাতা–১
১৬) জামুরিয়া ৫ ও ৬ নম্বর খাদ পো: জামুরিয়া	ইকুইটেবল কোল কো: লি: ১/২ ডি সিন্হা রোড, কলকাতা–১৬
১৭) ব্রাইটস রানা পো: চরণপুর	ডি ব্রাইট অ্যান্ড কো: প্রা: লি: পো: চরণপুর
১৮) সেন্ট্রাল জামুরিয়া	বি ডি গোরাচ, নুরুদ্দিন রোড পো: আসানসোল
১৯) ইস্ট জামুরিয়া	ইস্ট জামুরিয়া কোল কো: লি: ৪, ম্যাঙোভিলা গার্ডেনস কলকাতা–১৯
২০) নর্থ চরণপুর পো: চরণপুর	বি এন গাঙ্গুলী, উষাগ্রাম, পো: আসানসোল
২১) শিবপুর পো: চরণপুর	কাত্রাস ঝরিয়া কোল কোং লি: ৮, ক্লাইভ রো, কলকাতা–১

এইসব জমির যারা মালিক ছিলেন, মালিক হিসাবে প্রমাণ করার সাপেক্ষে তাদের কারোরই বৈধ প্রমাণপত্র নেই। আইন অনুযায়ী এই সব জমি খাস জমি হিসাবে রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত হবার কথা। কিন্তু ই·সি·এল- এর জমি দেবার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী এ ব্যাপারে বিভাগীয় অফিসারদের তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই ধরনের ২১টি কোলিয়ারি আছে।

ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কাজকর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সামান্য কিছু জানার পর প্রশ্ন জাগবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ হয়েছে তার কতটা ই·সি·এল পূরণ করতে পেরেছে? এ ব্যাপারে বর্তমানে সারা দেশে কয়লা শিল্পের অগ্রগতির হারটা খতিয়ে দেখলে একটি নৈরাশ্যজনক চিত্র ফুটে উঠবে আর সেক্ষেত্রে ই·সি·এল যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে সে সম্পর্কে কোন দ্বিমতই থাকবে না।

ব্যুরো অব পাবলিক এনটারপ্রাইজ সর্বশেষ যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে তাতে দেখানো হয়েছে ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে কেন্দ্রিয় সরকারের সংস্থাগুলি ১,১৯৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। লাভের অংক আরও বাড়তো যদি কয়েকটি শিল্পে অতিরিক্ত লোকসান না হত। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করা হয়েছে কয়লার। আমাদের দেশে বর্তমানে যে কয়লা মজুত আছে তাতে দু তিনশো বছর স্বাচ্ছন্দ্যে চলে যেতে পারে এবং অহেতুক দামও বাড়াতে হয় না। প্রয়োজন উদ্যোগ ও সততার। বিদেশ থেকে আমরা অনেক জিনিস বর্তমানে আমদানি করে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ক্রমশ পিছু হটছি, উদ্যোগ ও সততা যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব হত, তাও আমরা করতাম। উপায় যখন নেই আত্মসমালোচনা করে কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করাই ভাল। এখনও সময় আছে, অন্যথায় জাতীয়করণের কোন অর্থই থাকবে না, ই·সি·এল-এর কর্মকর্তারা কি বলেন?

-চন্দন নিয়োগী

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তি